Journal of Gono Bishwabidyalay
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)
Journal Homepage: https://gonouniversity.edu.bd/research/journal-of-gb/

Review Article

কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্প ঃ একটি বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ

ড. কৃষ্ণা ভদ্র[১]* ও মোঃ কয়েছ আহমেদ[১]

[১] বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।
*** Corresponding Author:** ড. কৃষ্ণা ভদ্র; ই-মেইল: dr.kbhadra2012@gmail.com; মোবাইল নং: +৮৮০১৩১১৪৫৬৪৪৮।
Received: 19/01/ 2025; **Accepted**: 29/07/2025; **Online Available**: 04/08/2025.

সারসংক্ষেপ

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বের অন্যতম বাংলা ভাষা-ভাষী জনসমাজে লোকপ্রিয় অভিধা বিদ্রোহী কবি। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর কবিত্বশক্তি ছাড়াও তিনি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সংগীতজ্ঞ হিসেবে পরিচিতি। সব পরিচয়ের পর একটি প্রতিভা উল্লেখ করতে হয় যে, তিনি ছোট গল্পকার। বহুমাত্রিক সাহিত্য কর্মের মাঝে ছোট গল্পের পরিমান বেশি নয়। তিনটি ছোটগল্প গ্রন্থে ১৮টি এবং সম্প্রতি *বনের পাপিয়া* নামে আরো একটি গল্প সংযোজিত করা হয়েছে। এ সব গল্পের তিনি যে শিল্পযুগকে ধারণ করেছেন, তা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের এক বিশাল আকার হিসেবে গৃহীত। কিন্তু আজো নজরুলের গল্প ও গল্পকার নজরুলের মূল্যায়ন ব্যাপকতা লাভ করেনি। তাই নজরুলের ছোটগল্পের বিচার বিশ্লেষণ ও পুঙখানুপুঙ্খ মূল্যায়ন জরুরী। শুধু নজরুলের প্রতিভার ও স্বরূপ অন্বেষণই নয়, বাংলা ছোট গল্পের বস্তুনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণ ও পুর্নপাঠ অপরিহার্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে বক্ষ্যমান রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নজরুলের গল্পে বিবৃত জীবন। এতে নজরুলের গল্পের বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তথ্যনি" ও সমাজের বিবিধ দিক সম্বলিত বাংলাগল্প ও গল্পকার নজরুলের বিশিষ্টতার স্বরূপ উম্মেচিত হবে। সেটাই এ আলোচনার অন্বিষ্ট।

মূল শব্দ সূচক: *সেনাসৈনিক, বিশ্বযুদ্ধ, রেনেসাঁস, স্বাজাত্যবোধ, ঔপনিবেশিক ও নারীচরিত্র*

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ছোটগল্পের আবির্ভাব। যা বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে দেশ, সমাজ, রাজনীতি ও সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও কাজী নজরুল ইসলাম বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ধর্ম, রাজনীতি, সরকার, সমাজ যা কিছু ব্যক্তির মানবিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে সেই দিকগুলোকে ভেঙ্গে তছনছ করার আহ্বান জানালেন। তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে সমাজের নিম্ন শ্রেণির নির্যাতিত এবং অবহেলিত, অধিকার বঞ্চিত মানুষের কথা ঘোষণা করলেন। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাবকে আকস্মিক বলে চিহ্নিত করা যায় না। কাজী নজরুল ইসলাম যে সময় সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন, সে সময় ভারতবর্ষ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০) খিলাফত আন্দোলন (১৯২১) সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আবহাওয়া বিরাজ করার পাশাপাশি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ডামাডোল বেজে উঠেছিল। তিনি তাঁর লেখনীতে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতে ভাব, দারিদ্র, লাঞ্ছনা, হতাশা, প্রভৃতির প্রতিফলন দেখিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম বজ্রকণ্ঠে মানবতার জয়ধ্বনি প্রকাশ করেছেন।

ছোট গল্পের প্রেক্ষাপট

কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি পল্টন থেকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত করেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক। তিনি যুদ্ধশিবির থেকে কলকাতার প্রবাসী, সওগাত, নবনূর, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির পত্রিকাতে লেখা পাঠাতেন। এসব পত্রিকায় ছাপা হয় নজরুলের রচনা-"বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী", "হেনা", "ব্যথার দান", "মেহের নেগার", "ঘুমের ঘোরে", ছোট গল্প। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে বাঙালি পল্টন ভেঙ্গে দিলে করাচী থেকে নজরুল কলকাতায় চলে আসেন। সে সময় থেকে তাঁর সৈনিক জীবনের সমাপ্তি হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন নজরুলের "ব্যথার দান" ও "রিক্তের বেদন" গ্রন্থের "বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী", "হেনা", "ব্যথার দান", "মেহের-নেগার", "ঘুমের ঘোরে", "স্বামীহারা" গল্পগুলো করাচী সেনানিবাসে বসে লিখেছিলেন। গল্পকার হিসাবে সৃষ্টিশীল জীবনের প্রথম পর্বে নজরুল ধারাবাহিকভাবে গল্প রচনা করলেও দ্বিতীয় পর্বে তিনি গল্প রচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি।

১৯১৭ সালে চাকুরী নিলেন ৪৯ নম্বর বাঙ্গালী পল্টনে। তিন বছর তিনি এ চাকুরী করেছেন। তাঁর চাকুরীজীবন ছিল মূলতঃ করাচীতে। এ সময় তাকে পেশোয়ার, নৌশেরা, বেলুচিস্তান পর্যন্ত যেতে হয়েছে। চাকুরী কালে অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি প্রথমে হাবিলদার ও পরে ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নীত হন। করাচীর সৈনিক জীবনকে বলা হয় প্রতিভার সাজঘর। চাকুরীকালে ১৯১৯ সালে তাঁর প্রথম গল্প "বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী" কলকাতায় সওগাত পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সংখ্যায়) এবং প্রথম কবিতা মুক্তি কলকাতার "বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য" পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়। এভাবে স্বার্থক লেখক হিসাবে নজরুলের বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ।

নজরুলের নিজের জবানীতেও এটা স্পষ্ট যে, কবি হিসাবে নয় গল্পকার হিসাবেই তাঁর আর্বিভাব। এ সম্পর্কে নজরুল নিজেই বলেন, "আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে। তারপর এলেন কবিতা হয়ে, তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভার হয়ে"। ছোটগল্পের প্রতি তাঁর অসাধারণ ঝোঁক ছিল। তাঁর শৈল্পিক কারুকর্ম বিধৃত আলোচনায় যা থেকে পাঠকের নিকট প্রতিদিনের জীবনযাপনের কথোপকথন, আলোচনা সমস্যা সমাধান, জানা-অজানা ব্যথা, সুখানুভূতি রূপকল্পে গল্পাকার নজরুলের বহুমাত্রিক দিকগুলো অন্বেষিত হবে।

নজরুলের ছোটগল্পে বাঙালির প্রেমময় জীবন ও সমাজ

বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী তাঁর প্রথম গল্প। এ গল্পের চরিত্রের মাধ্যমে নজরুল আবহমান বাঙালি জীবনের নিখুঁত রূপকে স্বাচ্ছন্দে বর্ণনা করেছেন। "পদ্ম গোখরা" ও "স্বামীহারা" গল্পে বাঙালি জীবনে কলেরা বসন্ত রোগের প্রকোপের ভয়াবহতা বিবরণ প্রত্যক্ষ গোচর। প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের পটভূমিতে নজরুলের দুটি গল্প যথা: "ব্যথার দান" (১৯২২) ও "রিক্তের বেদন" (১৯২৫) এ চরিত্র বর্ণনায় উনিশ শতকের রেনেসাঁস গল্প ও নারী জীবনের মর্মান্তিক উত্তর সমাজ জীবনে ব্যক্তিত্ব বোধের স্ফুরণ তুলে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন। "ব্যথার দান" গল্পে দারা, বেদৌরা, সয়ফুল-মূলক এই ত্রিভুজ প্রেমের আলেখ্য নজরুল নর-নারীর স্বাধীন প্রেম যেমন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের মহিমান্বিত প্রকাশরূপে বিধৃত করেছেন। তেমনি ভাবে এ গল্পে ব্যক্তি প্রেমে ব্যর্থ দারা ও সয়ফুল-মূলক মুক্তিসেবক দলে যোগ দিয়ে মানবতার পক্ষে লড়াইয়ে সামিল হওয়া সমকালীন যুগ চেতনাকে ধারণ করেছে। আর "রিক্তের বেদন" গল্পে হাসিন, শহিদা, গুল এই ত্রিভুজ প্রেমের মধ্য দিয়েও যুবক যুবতীর স্বাধীন প্রেমের কাহিনী লাইলী মজনু, শিরি, ফরহাদের উপাখ্যানের ধারা থেকেও বিচ্ছিন্ন নয়। তবে এ দুটি গল্পের চরিত্ররা নজরুলের নিজ বাসভূমি বাংলার বাইরে আফগানিস্তানের বাসিন্দা। বাংলার বহির্ভূত এই ভূখণ্ডের নিসর্গ চিত্র অঙ্কনে অবশ্য নজরুল নিজ মাতৃভূমির প্রকৃতিচিত্রকেই বর্ণনা করেছেন। আর এই গল্প দুটোর পাত্র-পাত্রীদের বিবরণস্থল শুধু ভারতবর্ষ নয়, মধ্য এশিয়া থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত।

"স্বামীহারা" গল্পে যেমন বাঙালি জীবনে মহামারীর প্রকোপ বর্ণিত হয়েছে, তেমনিভাবে "জিনের বাদশা" গল্পে বর্ণিত হয়েছে বাংলার গ্রাম জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত ভূত- প্রেতের অমূলক ভয়। ফরিদপুরের আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরবর্তী জনপদ ও জীবনের পটভূমিতে রচিত এ গল্পে চানভানু, আল্লারাখার প্রণয় উপাখ্যান মূল উপজীব্য হলেও এ গল্পে আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনের সরস বর্ণনা নৈপুণ্য মনোমুগ্ধকর। চানভানুর মায়ের অপত্যস্নেহ পিতার বাৎসল্যরস আর সেরাজ হালদারের বিচার বুদ্ধির অনুপম ভাষ্যে এ গল্পটি বাঙালি জীবনের চরিত্র চিত্রণে এক অনুপম সমাবেশ। গ্রামীণ জনপদের বাসিন্দা হলেও চানভানু আল্লারাখার প্রেমে যুগোচিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ দুনিরীক্ষ্য নয়, বরং বাঙালি মুসলমানের মানসগঠনে ক্রিয়াশীল পুঁথির নায়ক-নায়িকাদের স্বাধীন প্রেমের ঘটনাবস্তু সক্রিয় চালক হিসেবে নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়েছে। "অগ্নিগিরি" গল্পেও বাংলার গ্রামীণ জীবনের ভিন্ন চিত্রের সমাবেশ প্রত্যক্ষ করা যায়। এ গল্পে অসহায় যুবক সবুরের লজিং জীবনের বিড়ম্বনা বীররামপুরের রুস্তমদের দলের উপদ্রব যেমন প্রতিফলিত হয়েছে; তেমনি ভাবে সবুরের প্রতি আশ্রয়দাতা পরিবারের গৃহকর্ত্রী নূরজাহানের মায়ের স্নেহাধিক্য বাঙালি নারীর মহিমাময় মাতৃরূপেরই এক অনন্য প্রকাশ। আর লজিং থাকা চরিত্র সবুরের তত্ত্বাবধানে নসিবালী কন্যা নূরজাহানের পাঠগ্রহণ ঔপনিবেশিক বাংলায় লজিং জীবনের ভিন্ন একটি পরিপ্রেক্ষিতকেই প্রতিফলিত করে।

"মেহের নেগার" গল্পটির পটভূমি ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বাংলার বাইরের বৃহত্তর ভারত তথা আফগানিস্তান ও উজবেকিস্তানকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এই গল্পে সংগীত পিপাসু যুবক যুসোফ। তার মানসকন্যা মেহেরনিগার হঠাৎ দেখা যুবতী গুলশানের মধ্যে আবিষ্কার যেমন নাটকীয়, তেমনি বয়সোচিত রোমান্টিকতাজাত। মেহেনেগার যুবক যুসোফকে ভালোবাসে। কিন্তু তাদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় জাতগত সমস্যা। গুলশান ছিল মূলত বাঈজীর মেয়ে। এমনকি এই হীনমন্যতাবোধ থেকে রেহাই পেতে যুবতী গুলশান আত্মহননের পথকেই বেছে নেয়। ঘটনার এই করুণ পরিণতি যেমন মর্মন্তুদ, তেমনিভাবে তা সামাজিক বাস্তবতার এক নির্মম সত্যকেই প্রকাশিত করে। "এই নারী ভালবাসাতে জানে কিন্তু কোন অভিযোগ করতে জানে না। সে যেন এক বন্ধনের প্রতীক। গুলশান, বাঈজীর মেয়ে- রূপজীবিনীর কন্যা বলে নিজেকে সে মনে করে ঘৃণ্য, অপবিত্র, আর এই দুঃখময় অনুভূতির কারণেই প্রেমিকের সহানুভূতি নির্ভর অকৃত্রিম ভালবাসা সে গ্রহণ করতে পারে না এবং নিজ অন্তরে আলোড়িত প্রেমবোধকে চাপা দিয়ে ত্যাগের মাধ্যমে প্রেমের পবিত্রতা রক্ষা করতে ও প্রেমের সার্থকতা অর্জন করতে চায়। ফলে প্রেমাসম্পদের সঙ্গে তার মিলন হয় না, সে আশ্রয় নেয় মৃত্যুর কোলে। কিন্তু তার কবরের শিয়রে উৎকীর্ণ থাকে আত্মবিশ্বাসী এবং বেদনাময় অনুরোধ, "অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও ওগো পথিক, আমার ঘৃণা করো না"।...আমি অপবিত্র কিনা জানি না, কিন্তু পবিত্র ভালবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল" [১৫]। গুলশান-এর এই শেষ অনুরোধ তার চরিত্রে অন্য মাত্রা যুক্ত করে। গুলশানের এই বেদনাবহ পরিণতির জন্য দায়ী তার দ্বিধাগ্রস্থ

মন, তার সমাজ ও সমাজের সংকীর্ণ অনুদার মনোভাব। বস্তুত গুলশান বা মেহের নেগারের অন্তর্বেদনা, সামাজিক সংস্কার উদ্ভূত জন্ম যন্ত্রণা, আশুচিতাবোধ ও অন্তর্নিহিত প্রবল প্রেমাকাঙ্খা ব্যতিক্রমী মহিমায় তার চরিত্রকে মর্মস্পর্শী করে তোলে। "বাদল বরিষণে" আর "সাঁঝের তারা" গল্পে চরিত্রের আত্মকথন হৃদয়ঘটিত রোমান্টিক ভাবালুতার যে আবেশ তা নিসর্গচিত্রের অনুপম অনুসঙ্গে লিরিকধর্মী। এতে সামাজিক ঘূর্ণাবর্ত ততটা প্রকটিত না হলেও যুগোচিত রোমান্টিক প্রেম ভাবনার জারক রসে তা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের চেতনাসমৃদ্ধ হয়েছে। "শিউলিমালা" গল্পে (১৯৩১) সামাজিক পটভূমি গ্রাম নয় শহর। পাত্র-পাত্রীরাও উচ্চ শিক্ষিত। তবুও ধর্ম পরিচয় অস্বীকার করে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক বাঁধা। একই সঙ্গে এই গল্পের মুখ্য চরিত্র ব্যারিস্টার আজহারের দাবা খেলায় প্রতি তীব্র আকুলতা সমাজ জীবনে প্রচলিত ক্রীড়া কৌতুকের এক সজীব উপাদান মাত্র। "রিক্তের বেদন" গল্পে সমকালীন ঔপনিবেশিক বাংলা ও বাঙালির মানসিকতায় উদ্ভূত স্বাজাত্যবোধের তীব্র প্রকাশে নজরুলের সমকালীন যুগমানসের প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করা যায়।

"বাঙালি যুবক হাসিন যুবতী শহিদার প্রেমকে উপেক্ষা করে। হাসিন স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধিকল্পে ঔপনিবেশিক শক্তির পক্ষের যোদ্ধা হয়ে মিত্রবাহিনীতে যোগ দেয়। মধ্যপ্রাচ্যের সেনাশিবিরে অবস্থান করতে গিয়ে সাক্ষাত পায় বেদূঈন যুবতী গুলের। হাসিন গুলের প্রেম নিবেদন করলেও সৈনিকদের কর্তব্যে অটল হাসিন সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি। বরং ঘটনাচক্রে হাসিনদের নেতৃত্বাধীন সেনা শিবির থেকে অস্ত্র লুট করে পালাতে গিয়ে গুল কর্তব্যপরায়ণ সৈনিক হাসিনের গুলিতেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। বেদূঈন গুলকে বাঁচানের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজের কর্তব্যবোধকে যথাযর্থ মনে করেছেন। অথচ যুদ্ধ শেষে পল্টন ভেঙ্গে দেয়ায় নিঃস্ব হাসিন রিক্ত জীবনে মুখোমুখি হয় সব হারানোর তীব্র বেদনায়। স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি কল্পে প্রেমিকা শহিদার আকুল রোদনকে উপেক্ষা করেই যোগ দিয়েছিলেন বাঙালি পল্টনে। ক্যাম্প থেকে অস্ত্র লুট করে পালিয়ে যাওয়া গুলকে হত্যা করেছে সে সৈনিকের কর্তব্যবোধের তাড়নায়। অন্যথায় কর্তব্য পালনে গাফিলতির দায়ে স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধির পরিবর্তে স্বজাতি কলঙ্করঞ্জিত হবে এই মনোবৃত্তিই প্রণয়িনী গুলকে হত্যা করতে সক্রিয় ছিল হাসিন। তার কর্তব্যপরায়ণতার নি"ায় স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি পেলেও ব্যক্তি হাসিন পরিণতিতে রিক্ত নিঃস্ব রূপে সাগরের বেলাভূমিতে নিঃসঙ্গতার ঘেরাটোপে পর্যুদস্ত হতে থাকে। আমি আজ কাঙ্গাল না রাজাধিরাজ ? বন্দী না মুক্ত ? পূর্ণ না রিক্ত...[১]।

"ঘুমের ঘোরে" গল্পের নায়ক আজহারও পরীর প্রেমকে অগ্রাহ্য করে স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধির জন্য বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে পাড়ি জমায় আফ্রিকায়। সেনাশিবিরে যুদ্ধের ময়দানে প্রেমিকা পরীর স্মৃতি তাকে কাতর করলেও ব্যক্তি প্রেমের চেয়ে স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি করাই তার মনোজগতে প্রবল হয়ে বিরাজ করছিল। তাই যুদ্ধে যাবার আগে প্রেমিকা পরীকে বিয়ে করতে সে তার বন্ধুকে উদ্বুদ্ধ করে। পরীর স্বামী বাসর রাতেই ব্যক্তিপ্রেমের চেয়ে স্বাজাত্যবোধেকে লালন করায় আজহারের গুণমুগ্ধ হয়ে তার বীরত্বকে অকপটে প্রশংসা করেছে। আজহারের প্রেম বঞ্চিত পরীর কাছেও তার এই স্বাজাত্যবোধ তাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে সত্য। কিন্তু আজহার বা পরীর কারোর অন্তরেই বঞ্চিতকে পাবার আকুলতা আর রোমান্টিক প্রেমের স্মৃতি বিস্মৃতি হয়ে যায় না। যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে নিজের সহোদরা স্থানীয় পরীর বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আজহার ব্যক্তিপ্রেমের চেয়ে স্বাজাত্যবোধের মহিমা কীর্তন শুনতে পায়। একই সঙ্গে শুনতে পায় স্বাজাত্যবোধের যুপকাষ্ঠে বলী হওয়া ব্যক্তি প্রেমের রোদন [২]।

এই দুটো গল্পেই নরনারীর স্বাধীন প্রেমের অকপটে প্রকাশে যুগোচিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ যেমন মূর্ত হয়েছে, তেমনিভাবে যুগমানসে অঙ্কুরিত স্বাজাত্যবোধের তাড়নায় আত্মত্যাগের যে মহিমা অঙ্কুরিত হয়েছে তাও প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পকার সমাজ জীবনের এই দ্বৈতচিত্র সক্রিয় ভাবে স্বাজাত্যবোধের উজ্জ্বল প্রকাশকেই দেদীপ্যমান করেছেন। একইভাবে নজরুলের "রাজবন্দীর চিঠি গল্পেও ব্যক্তিপ্রেমের সাথে স্বাজাত্যবোধের এই যুগোচিত বিরোধের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। এ গল্পের নায়ক শ্রী ধূমকেতু তার প্রণয়িনী মানসীর প্রেম পায়নি। আর এই না পাওয়া প্রেমই তাকে ঔপনিবেশিক বিরোধী সহিংস আন্দোলনে যোগ দিতে প্রেরণা যুগিয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সহিংস তৎপরতা চালাতে গিয়ে সে বন্দী হয়ে জেলে সাজা ভোগের প্রহর গুনছে। আর জেল জীবনে ঔপনিবেশিক শক্তির নির্যাতনের পাশাপাশি আক্রান্ত হয়েছে সেকালের রাজরোগ যক্ষায়। ঔপনিবেশিক শক্তির সাজার মেয়াদ শেষ হলেও জেল সূত্রে আক্রান্ত যক্ষ্মা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই যেখানে নেই, সেই সমূহ বাস্তবতাকে সামনে রেখেই শ্রী ধূমকেতু তার প্রেম বঞ্চিত জীবনের চিঠি হিসাবে বর্ণনা করেছে এই গল্পের আখ্যান" [৩]। নজরুল তাঁর ছোট গল্পে ব্যক্তি জীবনের সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

নজরুলের ছোটগল্পে নারী চরিত্র

নজরুলের ছোটগল্পে অঙ্কিত নারী চরিত্রগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চরিত্র কয়েকটি বিশেষ টাইপের প্রতীক। যথা- (১) শঙ্খিনী জাতীয় নারী "ব্যথার দান" গল্পের বেদৌরা (২) সেবাপরায়ণ আত্মাভিমানী নারী- "রিক্তের বেদন" গল্পের শহিদা, গুল, "মেহের নেগার" গল্পের গুলশান, "হেনা" গল্পের হেনা (৩) আত্মাভিমানী নারী-"বাদল বরিষণে" গল্পের কাজরি (৪) সমাজ শাসনে নিপীড়িতা নারী- "ঘুমের ঘোরে" গল্পের পরী (৫) বিদ্রোহিনী নারী-"রাক্ষুসী" গল্পের বিন্দী (৬) পবিত্রতা নারী-"স্বামীহারা" গল্পের বেগম (৭) স্নেহশীলা মাতৃস্বভাবমণ্ডিতা নারী -"পদ্ম-গোখরা"

গল্পের জোহরা (৮) সেবাপরায়ণা ও লজ্জাবতী নারী- "জিনের বাদশা" গল্পের চানভানু, "অগ্নি-গিরি" গল্পের নূরজাহান, "শিউলি-মালা" গল্পের শিউলি। তবে বিভিন্ন গল্প থেকে যে টাইপগুলি চয়ন করে দেখানো হয়েছে সেগুলিই সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক বলে মনে হয় [৪]।
নিম্নে উপর্যুক্ত টাইপগুলি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলঃ

ব্যথার দান

শঙ্খিনী জাতীয় নারী বেদৌরা। সে সৈনিক দারার প্রেমিকা। দারার কর্তব্যে থাকাকালীন অনুপস্থিতিতে সে সয়ফুল-মূলক নামক এক যুবকের সঙ্গে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং জৈবিক তাড়নায় পদস্থখলিত হয়। তার মর্ম যন্ত্রনা, সর্বস্ব রিক্ততার গ্লানি বিচ্ছেদ বেদনা গল্পে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। অন্যদিকে বেদৌরাকে ক্ষমা করার প্রশ্নে, তাকে গ্রহণ করার প্রশ্নেও মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত দারা। "প্রতিনায়ক সয়ফুল-মূলক 'এক দেবীকে বিপথে' চালানোর অনুশোচনায়, বিবেকের দংশনে জর্জরিত। গল্পের শেষে অবশ্য প্রেমাস্পদ দারার কাছে বেদৌরা পায় ক্ষমা সুন্দর আচরণ এবং বিরহসিক্ত মানসিক মিলনের অঙ্গীকার। ফলে স্বাভাবিকভাবেই গল্পে উদারতা ও ক্ষমা পরায়ণতায় দারা চরিত্রটি মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। বরং পদস্থখলনের পরও বেদৌরাকে মর্যাদাময়ী করে রাখার প্রয়াস ছিল তৎকালীন সময়ের বিবেচনায় নতুন, উদার ও সংস্কারমুক্ত চেতনার নিদর্শন, নারী সম্পর্কে ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ " [৫]।

হেনা

বাঙালি সংযমী নারী চরিত্রের এক অত্যাশ্চর্য নিদর্শন হেনা, গুলো ও গুলশান। "হেনা" গল্পে হেনা চরিত্রে একটুও অশ্লীলতা ফুটে ওঠেনি তার কথায় কিংবা কাজে। আমরা প্রথমে দেখতে পাই গল্পের নায়ক একজন সৈনিক। সে হেনাকে ভালবেসে ফেলে। তাকে ভালোবাসার কথা জানিয়ে বলে-"হেনা তোমায় বড্ড ভালবাসি" [৬]। কিন্তু হেনাকে সোহরাবের প্রস্তাবে রাজি হতে দেখা যায় নি। হেনা তার ভাষায় বলে- "তার কস্তুরীর মত কালো পশমিনা অলকগোছা দুলিয়ে দুলিয়ে ব'ললে-সোহরাব, আমি যে এখনও তোমায় ভালবাসতে পারিনি [৭]। তারপর দু"বছর পর আবার সোহরাবের সঙ্গে হেনার দেখা হয়। তবে হেনার এই দু'বছরে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সে একবার সরাসরি বলেছে- যে (যদি আমার আপত্তি না থাকে) সে আমায় তার সঙ্গী রূপে পেতে চায়। আমি বললুম- না, তা হতেই পারে না [৮]। তারপর দুবছর পর আবার সোহরাবের সঙ্গে হেনার দেখা হয়। তবে হেনার এই দু'বছরে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সে একবার সরাসরি বলেছে, তখন সে আরও সংযমী হয়েছে। হেনা নিজেকে আরও মহৎ ও মহান করে তুলেছে। তাই তাকে বলতে দেখা যায়- "তবে আমাকে ভালবাসতে দেবে তো ? অন্ততঃ ভাই এর-মত....[৯]। "দুনিয়ার সব চেয়ে মস্ত হেয়ালী হচ্ছে মেয়েদের মন" [১০]।

কিন্তু নারীর মন হেয়ালী হলে এক্ষেত্রে হেনাকে দেখা যায় অন্যরকম। সে সোহরাবকে পেয়েও তাকে যুদ্ধে যেতে বাধা দেয়নি- "সোহরাব, প্রিয়তমা তাই যাও। আজ যে আমার ব'লবার সময় হয়েছে, তোমায় কত ভালবাসি। আজ আমার অন্তরের সত্যিকে মিথ্যে দিয়ে ঢেকে আশেক'কে কষ্ট দেব না..."। আমি বুঝলুম, সে বীরাঙ্গনা-আফগানের মেয়ে। যদিও আফগান হয়েও আমি শুধু পরদেশীয় জীবন যাপন করেই বেড়িয়েছি, তবু এখন নিজের দেশের পারে আমার জীবনটা উৎসর্গ করি, এই সে চাচ্ছিল। ওঃ রমনী তুমি! কি করে তবে নিজেকে এমন করে চাপা দিয়ে রেখেছিলে হেনা?" [১১]। তাই হেনাকে আমরা যেমন সাহসী নারী হিসেবে পেয়েছি, তেমনি ধৈর্য্যশীলা প্রেমিকা ও আত্মসংযমী নারী হিসেবে দেখেছি। অন্য দশ নারী থেকে আত্মনিয়ন্ত্রিত নারী। যে নিজেই নিজের মহিমাকে ধরে রাখতে দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ। কারণ-"সে সোহরাবকে আদর্শবাদী দেশ প্রেমিক ও বীরযোদ্ধারূপে দেখতে চেয়েছিল, সে চেয়েছিল সোহরাব দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করুক। তাই সোহরাব যখন সত্যিই দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলো, যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত হলো, তখন হেনা নিঃসঙ্কোচে সোহ্‌রাবের কাছে নিজের ভালবাসার কথা জানিয়ে আত্মসমর্পন করলো। আর এখানেই হেনা চরিত্রের বিশিষ্টতা, সে কোন সাধারণ প্রেমিক চায়নি, চেয়েছে আদর্শবাদী, দেশ প্রেমিক সোহ্‌রাবকে। এই চাওয়া তাকে করেছে মহৎ ও স্বতন্ত্র" [১২]।

রিক্তের বেদন

গল্পে আমরা দেখতে পাই, গুল ভালবাসতে জানে। সে নিঃস্বার্থভাবে হাসিনকে ভালবাসে। কিন্তু হাসিন তাকে ভালেবাসেনি। কিন্তু তাতে তার কোন অভিযোগ নেই। সে তার অনুভূতি অন্যরকম ভাবে প্রকাশ করেছে। গুলকে দেখা গেছে গুণ দিয়ে সে কঠিন হাসিনের মনে ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে, এ তার এক আশ্চর্য শক্তি। যে শক্তি অনেক নারী চরিত্রে দেখা যায় না। "সত্যিই ত, একি নতুন উম্মাদনা জাগিয়ে দিচ্ছে প্রাণে গুল। আমার কি একটা কথা মনে পড়ছে সকল গরব হায় নিমেষে টুটে যায়, সলিল বয়ে যায় নয়নে" [১৩]। শেষে দেখা যায় ভুলবশত হাসিনের গুলিতেই সে প্রাণ হারায়। কিন্তু অনেকক্ষণ পরে সে চোখ খুলে কোন অভিযোগ করেনি। "অনেকক্ষণ পরে সে আস্তে চোখ খুলে আমার মুখের পানে চেয়েই চোখ বুজে বললে, "এই আশেকের" হাতে "মাশুকের" মরণ বড় বাঞ্চনীয় আর মধুর নয় হাসিন ? [১৪]

বাদল বরিষণে

আত্মভিমানী নারী হিসাবে দেখা যায় কাজরিকে। তার অভিমান ছিল সমাজ সংসারের প্রতি যতটা নয় তার চেয়েও বেশি ছিল বিধাতার উপর। সে ছিল কৃষ্ণাঙ্গ রূপী, ফলে সে কারও উপেক্ষার পাত্রী হতে চায় না। তাই কালো বর্ণ তাকে করে তুলেছে বড় বেশি চাপা ও অন্তর্মুখী। আত্মদৈন্যে পীড়িত আত্মাভিমানী এই তরুণীর ধারণা, সে কালো কুৎসিত, সকলের উপহাসের পাত্রী, কেউ তাকে ভালবাসতে পারে না। কিন্তু গল্প শেষে দেখা যায় এক পরদেশী শ্যামল তরুণের অপ্রত্যাশিত প্রেম প্রাপ্তির আনন্দ ও ভালবাসার পরিপূর্ণ গৌরব নিয়ে সে মৃত্যুবরণ করে, তার কালো রূপ মিশে যায় বর্ষার নৈসর্গিক সৌন্দর্যে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে। নৈরাশ্য আর চিত্তবৈকল্যে আহত নিবিড় কালো কাজরি স্বভাবতই সংবেদনশীল পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করবে, অন্য কিছু নয়। গল্পের নায়িকা নায়ককে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করে, "পরদেশীয়া রে, তুহার দেশ কাহা?" [১৬]।

ঘুমের ঘোরে

সমাজ শাসনে নিপীড়িতা নারী চরিত্র পরী। এই নারী সমাজ সংসারে প্রতিবাদ করতে শেখেনি। সে সমাজের সকল কথাই মেনে নিয়েছে। তাই পরী তার ভালবাসার কথাটি পরিবারের কাউকে বলতে পারেনি। গল্পে দেখা যায়-"সে তার ব্যথিত দুটি আঁখির অন্তদৃষ্টি দিয়ে আমার পানে অনেকক্ষণ চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে ব'ললে- "না"- তারপরেই যেন তার কি কথা মনে পড়ে গেল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ক'য়ে উঠল-"আপনি! এখানে কেন আর? যান..." এক নিমিষে, এমন আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না যেন দপ ক'রে নিভে গেল। একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতের বেদনায় সমস্ত দেহ আমার অনেকক্ষণের জন্য নিঃসাড় হয়ে রইল। কখন যে মাথা ঘুরে প'ড়ে পাশের বেঞ্চিটার হাতায় লেগে আমার বাম চোখের কাছে অনেকটা কেটে গিয়ে তা দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে খুন ঝ'রছিল, আর পরী তার আঁচলের খানিকটা ছিড়ে আমার ক্ষতটায় পটি বেঁধে দিয়েছিল, তা আমি কিছুই জানতে পারিনি। যখন চোখ মেলে চাইলুম, তখন পরী আমার আঘাতটাকে জল চুঁইয়ে দিচ্ছে, আর চোঁয়ানো জলের চেয়েও বেগে তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু চুঁয়ে পড়ছে!...এতক্ষণে আহত অভিমান আমার সারা বক্ষ আলোড়িত ক'রে গুমরে উঠল। বিদ্যুৎদ্বেগে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আহত স্বরে ব'ললুম, "বড় ভুল হ'য়েছে পরী, তুমি আমায় ক্ষমা ক'রো"। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে যেন কি সামলে নিলে, তার পরে আনমনে চিবুক- ছোঁওয়া তার একটা পীত গোলাপের পাপড়ি নখ দিয়ে টুঙতে টুঙতে অভিভূতের মত কি বলে উঠল। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না, ব'ললুম-"তবে যাই পরী"। অশ্রু বিকৃত কণ্ঠে সে ব'লে উঠল, "আহা! তাই যাও " [১৭]। পরীর বিয়ে হয়ে যায় পরিবারের ইচ্ছানুসারে। সেখানে পরী কোন পছন্দের মতামত দেয়নি। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানে পরীর ভালবাসার মানুষটি উপস্থিত থাকলেও সে তাকে কিছুই বলতে পারে নি। তার সেই দুঃখ নিয়েই সে সংসার জীবন করতে থাকে। যেদিন ভালবাসার সেই আজ্হার যখন তার কাছ থেকে যুদ্ধে যাবার জন্য শেষ বিদায় নিতে এসেছিল সে দিন সে নিজেকে অপরিসীম ধৈর্য্যের সাথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। সত্যিকার ভাবে পরী তার স্বামীকে ভালবাসলেও আজ্হারকে সে ভুলতে পারেনি। সে ফুল-শয্যার রাতেও আজহারের জন্য ব্যথিত থেকেছে। তাই আজহার ও পরীর জীবনে ভালবাসা অতৃপ্তিই রয়ে যায়, আহা! ভালবাসা যায় না, তাদের জীবন বড় দুঃখের, বড় যাতনার। আবার এই জন্যে সেটা যাতনার যে, ঐ না ভালবাসার দারুণ কাউকে অভিযোগ করবারও নেই। জোর ক'রে তো আর কাউকে ভালবাসানো যায় না। "আমি কি আবার ভালবাসতে পারবো গো? কি ক'রে ভুলব? যে বিদায় নিয়ে এমন ক'রে জয়ী হ'য়ে চলে গেল, তাকে যে সারা জীবনেও কিছুতেই ভুলা যায় না। তিনি যদি আমার সামনে থেকে অন্য কোন দিকে জীবনটা সার্থক করে তুলতেন, তা হয়তো তাঁকে ভুলতেও পারতাম। সব হারিয়ে যে এমন জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিলে এই হতভাগিনীর জন্যে, হায় তাকে কি ভোলা যায়? নারীর ভালোবাসা কি এত ছোট?

ঐ যে এখনও আমার স্বামী তেমনি হাসি মুখে গাচ্ছেন,–

"গো দেখি আঁখি
তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুম-ঘোর " [১৮]।

জীবন সংসারে আজহার ও পরীর ভালবাসা অতৃপ্ত কামনা-বাসনা সবাইকে ব্যথিত করেছে কিন্তু সমাজের বিধি বিধান যে উপেক্ষা করতে পারেনি। ফলে কঠিন আত্মজিজ্ঞাসা ও সূক্ষ্ম অর্ন্তদ্বন্দে জর্জরিত আধুনিক বোধ সম্পন্ন পরী চরিত্র উৎকর্ষ ও মাধুর্য্যে নজরুল সৃষ্ট নারী চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

রাক্ষুসী

রাক্ষুসী গল্পে এক বিদ্রোহী নারী বিন্দী। সমাজের সবাই তাকে রাক্ষুসী হিসেবে চিনে। রাক্ষুসী গল্পে বিন্দী রাক্ষুসী হওয়ার ঘটনাটি লেখক স্পষ্ট করে তুলেছেন রাক্ষুসীর জবানীর মধ্যে দিয়ে। তাই সে বলে, "যদি এই রকমই ক'রতে থাকে, তবে আমি সত্যিকারের রাক্ষুসীই হয়ে দাঁড়াব বলে রাখছি তখন। এক এক দায়ের কোপে ওদের সোয়ামীর মাথাগুলো ধর থেকে আলাদা ক'রে দেব, মেয়েগুলোর কলজে গুলো ধরে পিষে পিষে দেব, তবে না সে আমার নাম সত্যি-সত্যি। রাক্ষুসী হয়ে দাঁড়াবে " [১৯]। সমাজ তাকে পাগল করেছে। তাকে সুস্থভাবে বাঁচতে দেয়নি। বিন্দীর

দুই ছেলে এক মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে ভালভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। তার সুখের সংসার ছিল। কিন্তু এই সংসারে যখন ফাটল ধরেছে তখন সে আর সইতে পারেনি। তার স্বামীকে পাপের হাত থেকে বাঁচাতে খুন করেছে। তাকে সে নরকে যেতে দিতে পারে না; "আমি মনকে শক্ত করে ফেললুম। হাঁ হত্যেই করব, যা থাকে কপালে! ভগবান তুমি সাক্ষী রইলে, আমি আমার দেবতাকে নরকে যাবার আগে তাঁর জানটা তোমার পায়ে জবা ফুলের মত "উচ্ছুগু" করব তুমি তাঁর সব পাপ খণ্ডন ক'রে আমাকে শুধু "দুখ্খু" আর কষ্ট দাও! আমার তাই আনন্দ" [২০]। সে তার স্বামীকে দেবতার মত মনে করত। দেবতা এত নীচু হতে পারে না। তাই তার স্বামী অন্য নারীর সঙ্গে পাপ কাজ করবার আগেই সে তাকে সরিয়ে দিয়েছে এক সাহসী ভূমিকায়। "সে নিজে নরকে যেতে পারে কিন্তু তার স্বামীকে সে নরকে যেতে দিতে পারে না। তার প্রশ্ন যদি আজ তার স্বামী যে কাজ করেছে সেটি সে করত তখন সমাজ কি করত। আমি যদি ঐ রকম একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসতুম আর যদি আমার সোয়ামী ঐ জন্যে আমাকে কেটে ফেলত তাতে পুরুষেরা একটি কথাও বলত না। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও বলত, হ্যাঁ, ও রকম খারাপ মেয়ে মানুষের ঐ রকম মরা উচিত! কারণ তারাও বরাবর দেখে আসছে, পুরুষের সাত খুন মাফ" [২১] । পুরুষ মাফ পেলে নারী কেন পাবে না। জেলে থাকতে সে ভালই থেকেছে। শান্তিতে ঘুমিয়েছে। যখন জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে বিন্দীর প্রশ্ন তাকে পাগল করেছে কে? তাকে রাক্ষুসী বানিয়েছে কে? এ সকল সমাজের মানুষের ভাবনার সে পরিবর্তন চায়। সে ভালভাবে বাঁচতে চায়, সুখে শান্তিতে থাকতে চায়। যেখানে কেউ তার জীবনকে আর বিষিয়ে তুলবে না। আত্মযন্ত্রনায় সে যখন দ্বিগবিদিক হয়ে উঠেছে তখন সমাজ তাকে আরও অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এখান থেকে সে মুক্তি চায়। মূলত এই বিন্দী এক বিশেষ ধরনের প্রতিবাদী রূপ।

স্বামীহারা

জন্ম জন্মান্তরের ধারাবাহী পতিব্রত্যের সংস্কারে বদ্ধ ভারতীয় নারীর সহিষ্ণুতা যে একমাত্র সর্বংসহা ধরিত্রীর সঙ্গেই তুলনীয় তা এই "স্বামী হারা" গল্পের বেগমের নমনীয় চরিত্রের সংস্পর্শে এসে সে কথা বোঝা যায়। গরীবের মেয়ে হয়েও সৈয়দ বংশে ভাগ্যগুণে বিয়ে হয়েছিল তার। স্বামী আজিজ এবং শাশুড়ি ছিল তার সকল সান্তনার স্থান। দেবতারূপী স্বামী এবং দেবীরূপী শাশুড়ি পেয়ে দুটি বছর ভালই কেটেছিল। বাধ সাধল কলেরা, এই রোগে যখন সমস্ত গ্রামের মানুষ উজাড় হচ্ছে এবং গ্রাম ছাড়ছে তখন আজিজ সেই অসহায় মানুষের সেবায় এগিয়ে গিয়েছিল। তার সেবার ধরণ ছিল এরকম-

"দিন নেই, রাত নেই, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, আর্তের চেয়েও অধীর হয়ে তিনি ছুটে বেড়াতে লাগলেন কলেরা আর বসন্ত রোগী নিয়ে। আমি পায়ে ধরে বললুম, ওগো দেবতা! থাম, থাম, তুমি অনেকের হতে পার, কিন্তু আমার যে, আর কেউ নেই। ওগো আমার অবলম্বন থাম, থাম! হায়, যাঁকে চলায় পেয়েছে তাঁকে আর থামায় কে? বিশ্বের কল্যাণের জন্য ছুটছিল তাঁর প্রাণ। তাঁর সে দুনিয়া ভরা বিছানো প্রাণে আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণের কান্নার স্পন্দন ধ্বনিত হত কি? যদি হত তব শুধু ছুঁয়ে যেত নুয়ে যেত না" [২২] । স্বামী হারা গল্পে যেমন- বাঙালি জীবনে মহামারীর প্রকোপ বর্ণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আজিজ সেবা করতে করতে নিজেকে উৎসর্গ করল। সেই সঙ্গে আজিজের মাও মারা গেলেন। আর দুর্ভাগ্যের অমানিশা, অসহায় ও অসহ্যের জীবন শুরু হল বেগমের। সেও এই বেদনা বেশি দিন সইতে পারেনি। মানুষ তাকে পাগলী, রাক্ষুসী বলেছে। কিন্তু সমাজের এই অপবাদেও সে বিচলিত হয়নি। সে বিষ খেয়ে বা হারাম পথে মৃত্যুবরণ করেনি, নিজেকে রেখেছে অবিচলিত, দৃঢ়তার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করেছে নিজেকে। লেখক এই সমাজের মধ্যে এক আশ্চর্য নারী তৈরি করলেন। যে সকল বিপদেও অবিচলিত, নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে পথ চলতে দীক্ষা দিয়েছে সমাজকে। লোভ, লালসা, কামনা, বাসনা তাকে বিপথগামী করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত এই সাহসী নারীর মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই।

পদ্ম-গোখরো

জোহরা মাতৃস্নেহশীল এক নারী। নারীর কাছে মাতৃত্বই বড়। সে মা হতে চায়। জোহরাও মা হয়েছিল। বিয়ের এক বৎসরের মধ্যে তার দুটি জমজ সন্তান হয় এবং আতুঁড় ঘরেই মারা যায়। কিন্তু জোহরা তার মাতৃত্বের ক্ষুধা সে মিটিয়ে ছিল এক জোড়া পদ্ম গোখরাকে নিয়ে। তাই দুই সন্তানের প্রতিকৃতি পেয়েছিল এই গোখরাদ্বয়ের মধ্যে। জোহরার হাতে ছাড়া আর কারও হাতে গোখরাদ্বয় দুধ পান করেনি। আরিফের বাবা, মা যখন তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিল সেই থেকে ছয় মাস পর্যন্ত তারা ক্ষুধায় কষ্ট করেছে কিন্তু তাদের মাকে ছাড়া তারা দুধ পান করেনি। ছয় মাস পর জোহরা তার শ্বশুড় বাড়িতে ফিরে আসে। "ঐদিন গভীর রাত্রে জোহরা স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার মৃত খোকা দুইজন যেন আসিয়া বলিতেছে, "মাগো, বড় ক্ষিদে, কত দিন আমাদের দুধ দাওনি! আমরা কবরে শুয়ে আছি, আর উঠতে পারিনে। একটু দুধ! মা! একটু দুধ!মা বড় ক্ষিদে!" "খোকা" "খোকা" বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া জোহরা জাগিয়া উঠিল। দেখিল, স্বামী ঘুমাইতেছে। প্রদীপ জ্বালিয়া কি যেন অন্বেষণ করিল, কেহ কোথাও নাই। সে আজ উন্মাদিনী! সে আজ শোকাতুরা মা, সে পুত্রহারা জননী! তাহার হারা-খোকা ডাক দিয়াছে, তাহারা ছয় মাস না খাইয়া আছে! পাগলের মত সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ির সম্মুখে মীর পরিবারের গোরস্থান। ক্ষীণ শিখা প্রদীপ লইয়া উন্মাদিনী মাতা দুইটি কবরের পার্শ্বে আসিয়া থামিল। পাশাপাশি দুইটি ছোট্ট কবর, যেন দুটি যমজ ভাই গলাগলি করিয়া শুইয়া আছে"।

সেই রাতে জোহরা কবরের উপর মূর্চ্ছিতা হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, পরে জেগে উঠে সে দেখল তার বুকে কুন্ডলী পাকিয়ে আছে পদ্ম গোখরাদ্বয়। তাদেরকে নিয়ে সে রান্না ঘরে দুধ খাওয়াতে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু শাশুড়ি এটি সহ্য করতে না পেরে গোখরাদ্বয়কে বালাই বালাই বললে জোহরা প্রতিবাদ করে বলে- "ষাট, ওরা বালাই হবে কেন মা? ওরা যে আমার খোকা!" শাশুড়ি বুঝিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, "সত্যিই ওরা তোমার খোকা বৌমা। তুমি চলে যাবার পর আমারা দু'একদিন ওদের দুধ দিয়েছিলাম। ও মা শুনলে অবাক হবে, ওরা দুধ ছুঁলেই না। চলে গেল! সাপও মানুষ চেনে! জোহরার এই মাতৃত্ব এক আশ্চর্য রূপধারণ করেছিল। তার বাবার মৃত্যুর চেয়ে এই পদ্ম গোখরার মৃত্যু তাকে আর বাঁচার সাহস দেয়নি। সে অন্তঃস্বত্তা থাকা সত্ত্বেও এই সন্তানরূপী গোখরাদ্বয়ের মৃত্যু সে সইতে পারেনি। জোহরা এই সংবাদ শোনার পর "এ্যা খোকারা নাই? বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল" [২৩]। জোহরা অজ্ঞান হবার পর কি হয়েছিল এবং এই মায়ের খবর কি বেদনাবিধুর লেখক কবি নজরুল ইসলাম তা আমাদেরকে এইভাবে জানান-"ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বৌ এক জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে" [২৪]। আবার চানভানু ওরফে চানভানু, নূরজাহান ও শিউলিকে দেখা যায় বাঙালি লজ্জাবতী নারী রূপে। তারা ভালবেসেছে কেশবরঞ্জন বুবু ওরফে আল্লারাখা, সবুর ও আজ্‌হারকে। কিন্তু তাদের বুক ফেটেছে অথচ মুখ ফোটেনি। তারা তাদেরকে সরাসরি বলতে না পারলেও অন্যভাবে বুঝিয়েছে তাদের ভালবাসার কথা, তারা ভালবেসে বিয়ে করেনি, তারা ভালোবেসে কষ্ট পেয়েছে কিন্তু ভালবাসাকে উপভোগ করেনি। এই তিন নারী বাঙালি লজ্জাবতী নারীর স্বমূর্তি নিয়ে হাজির হয়েছে আমাদের সমাজের সামনে। যা অতি বিস্ময়কর করে তুলেছে তাদেরকে, ফলে তারা এক অনন্য ও অসাধারণ নারী চরিত্র হয়ে উঠেছে।

নারীদের সম্পর্কে নজরুলের উক্তি

এছাড়াও নজরুলে বেশ কিছু ছোট গল্পে প্রত্যক্ষ নারী চরিত্র বিরল। কিন্তু পরোক্ষভাবে নারীকে পাই। যদিও নজরুল ইসলাম তাদের নাম উল্লেখ করেননি। মূলত তারা কঠিন ও নিষ্ঠুর হৃদয়ের নারী যাদের একটুখানি ভালবাসা পাবার জন্য লেখকের হৃদয় ব্যাকুল হয়েছে। তাই তিনি বলেন- "কিছুতেই তোমাদের মনের কথাটা পাওয়া যায় না, সব ভালবাসাটুকু পাওয়ার আশাতো মরীচিকার পেছনে ছোটার মতই, কোথায় যেন তোমাদের মনে সীমারেখা, কোথায় যেন তোমাদের ভালবাসার, কোথায় যেন তার শেষ! আমি তাই অবাক হয়ে অনেক সময় ভাবি আর ভাবি। মনে ক'রো না যে, এগুলো সকলেরই মনের ভাব। আমি আমার এখনকার মনের ভাবগুলো সোজাসুজি জানাচ্ছি। তোমার সঙ্গে তা না মিলতেও পারে। এমনি করে পুরুষ নারীর কাছে চিরদিন প্রতারিত হয়ে আসছে। কারণ তারা বাইরে যত বড় কর্মী বিদ্বান আর বীর হোক না কেন তোমাদের কাছে তারা এক নম্বর বোকা, একেবারে ভেড়া বনে যায় বললেও অত্যুক্তি হয় না। তোমাদের কাছে থেকেও তোমাদের মন বুঝতে স্বয়ং ভগবান পারবে না, এ আমি আজ আর জোর গলায় ব'লছি। তোমরা নারী, তোমাদের স্বভাবই হচ্ছে স্নেহ করা, সেবা করা, যে কেউ হোক না কেন, তার দুঃখ দেখলে তোমাদের প্রাণ কেড়ে; ওঠে, একটু সেবা করতে ইচ্ছা হয়। ওতে আমাদের গভীর আত্মপ্রসাদ, নিবিড় তৃপ্তি। এইখানে তোমরা দেবী, সন্ন্যাসিনী। এই ব্যথিতের ব্যথা মুছাতে তোমরা সকল রকম ত্যাগ স্বীকার করতে পার। নারী হৃদয় এত কঠিন হতে পারে, যা অতি আশ্চর্য। নারী সাধারণত কোমল, রমনীয়, মায়াবী কিন্তু মাঝে মাঝে নারীকেও এক নির্দয় ও অকোমল হৃদয়ের অধিকারী হতে দেখা যায়। নজরুলের জীবনে মিস ফজিলাতুন্নেছা নামক এক নারীকে দেখা যায়। যার কাছ থেকে তিনি উপেক্ষিত হয়েছেন। তারই প্রভাব কিছু কিছু ছোটগল্পের নারীর মধ্যে পড়েছে কিন্তু তাই বলে সবাইকে ভালবাসতে পার না আর ভালবাসও না। এইখানে পুরুষ সাংঘাতিক ভুল করে বসে। তোমাদের ঐ সেবা আর করুণাটুকু সে ভালবাসা বলে ভুল করে দেখে [২৫]। মূলত নজরুলের গল্পসমূহে নারীরা এসেছে তাঁর বিচিত্র জীবন থেকে এবং তাঁরা বিচিত্ররূপে রূপায়িত হয়েছে। কখনো তাদেরকে দেখা যায় অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী আবার কখনো ভীষণ অভিমানী এবং আবেগপ্রবণ। কাউকে দেখা যায় পুরাতন মূল্যবোধের একনিষ্ঠ পূজারী আবার কাউকে দেখা যায় মুক্ত চিন্তার অধিকারী একযুগ সচেতন সাহসী নারী। তাই তাঁর সকল নারীই যেন এক কঠিন বাস্তবতাকে ধারণ করে আর এক বাস্তবতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। যা বাংলা সাহিত্যে অনন্য ও অসাধারণ।

পুরুষ চরিত্র ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিফলন

পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে নারীর মর্যাদাহীন অবস্থা এবং নারীও যে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে, সে বিষয়েই এখানে বিন্দী ইঙ্গিত করেছে। বলা প্রয়োজন, বিন্দি সেই অর্থে কোন পুরোদস্তর বিদ্রোহী চরিত্র নয়। বাস্তব পরিস্থিতি, ধর্মীয় কর্তব্যবোধ ও স্বামীর প্রতি ভালবাসা তাকে খুনি বানিয়েছে, প্রথমে স্বীয় স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বহীন আচরণ ও পরবর্তীতে গ্রামের লোকের ক্রুর লাঞ্চনা তাকে উপলদ্ধি করতে শিখিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিষ্ঠুরতাও সিংহাত্মক প্রবণতাগুলোকে। বিন্দির বেদনান্তে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি এমন এক ভাগ্যহতা নারীর মনস্তত্ত্ব পরিস্ফুট করে তোলে, যে প্রতিকুল অবস্থার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রামশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং এক অনমনীয় আত্মসম্ভ্রমপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী [২৬]। বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনীতে এক বখাটে যুবকের জবানীতে নজরুল কৈশোর পেরুনোর আগে বাঙালি তরুণের দু'দুবার পরিণয় সূত্রে বাঁধাপড়া, কিশোরী বধুও জীবনের বিড়ম্বনা, মায়ের অপত্যস্নেহ আর পিতার পুত্রকে ত্যাজ্য করার ঘটনার মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছে। "স্বামী হারা" গল্পের অসহায় নারী বেগমের প্রতি আত্মীয় পরিজনদের হয়রানি ও বিড়ম্বনার চিত্রের মধ্যেও সংকীর্ণ ও

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ জীবনের হয়রানি মূলক মনোভঙ্গির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। এছাড়াও নজরুল তার বেশির ভাগ গল্পেই পুরুষ চরিত্রে সৈনিক চরিত্রটির রূপায়ণ করেছেন। নিজের মাতৃভূমির প্রতি অগাধ ভালবাসাই তাঁর প্রতিফলন।

প্রকৃতির বর্ণনা ও গ্রাম বাংলার ছড়াপুঞ্জ

নজরুলের প্রতিটি গল্পে আবহমান প্রকৃতিপুঞ্জকে উপস্থাপন করেছেন। যা মনোমুগ্ধকর। "অতৃপ্ত কামনা" গল্পে বিরহ প্রেমাসক্ত যুবকের মুখে আমরা শুনতে পাই-

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে?
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে। [২৭]

এমনিভাবে প্রতিটি গল্পে আমাদের গ্রাম বাংলার প্রকৃতির নৈসর্গিক রূপ-লাবণ্যের বর্ণনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ছোটগল্পে।

সীমাবদ্ধতা

"গল্পকার নজরুলের সাহিত্যিক অভিযাত্রা শুরুর আগেই বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের পথিকৃৎ ও মহান শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অনুপম শিল্প কৌশল পাঠকচিত্তে ও বিশ্বসাহিত্যে অনন্য শিল্প প্রকরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি তখন গল্পকার নজরুলের গল্প রচনা অব্যাহত ছিলো। সম্ভবত এ কারণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একজন চমৎকার গল্পকার হওয়া সত্ত্বেও নজরুল সমকালীন পাঠক সমালোচক মহলে তেমনটা নজর কাড়তে পারেননি। তিনি গল্পকার হিসেবে আবির্ভূত হলেও নজরুল তাঁর স্বতন্ত্র স্বর ও প্রকরণের অনন্য সব কবিতা রচনার মাধ্যমে পাঠক ও সমালোচক মহলে এতটাই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন যার ফলে প্রতিষ্ঠার আঁড়ালে চাপা পড়ে যায় তাঁর গল্প রচনার শিল্পসিদ্ধি" [২৮]।

ব্যতিক্রমধর্মী অনুসন্ধান

তেমনি উচ্চবিত্ত জীবনের পাত্র পাত্রীদের নিয়ে নজরুলের একটি গল্প বনের পাপিয়া। এ গল্পে যৌতুকের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে জীবন প্রতিষ্ঠার সমায়োচিত এক আখ্যান গড়ে উঠেছে দুটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে। সুন্দরী স্ত্রী আর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরীতে নিয়োগ পাওয়া মিঃ কৃষ্ণ স্থূলকায় ও কুৎসিত দর্শন এক পুরুষ। তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে স্ত্রীর পরিবারের ভূমিকার কারণে স্ত্রীর উপদ্রবের মুখেও সে নির্বিকারে থাকে। কিন্তু পদ্মা পাড়ি দিতে গিয়ে হঠাৎ একদিন উড়ে আসা এক অসুস্থ পাপিয়ার প্রতি স্ত্রীর বাড়াবাড়ি রকমের আগ্রহ ও নানা ঘটনা প্রবাহে মিঃ কৃষ্ণ এতটাই বিচলিত হয়ে পড়ে যে, স্ত্রীর ভালবাসা ফিরে পেতে বনের পাপিয়াকে নিজ গৃহ থেকে নিয়ে গিয়ে পদ্মার থইথই স্রোতে নির্বাসন দেয়। সন্তানহীনা স্ত্রীও এই ঘটনা জেনে বনের পাপিয়াকে ফিরিয়ে আনতে প্রমত্ত পদ্মার ফিরে যায়। পাপিয়ার যেখানেই ঘটে সলিল সমাধি। "দুরন্ত পথিক" কথিকা ভিত্তিক গল্প। সেখানে পথিকরূপী সাহসী মানবের দৃঢ় কণ্ঠ। নজরুল কথিকার মাধ্যমে আমাদের চিরন্তন শাশ্বত বাণী, পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হবে তা উপস্থাপন করেছেন। "সালেক" গল্পে দরবেশ, বাদশা, উজির, নাজির, কথোপকথন, আমাদের বাস্তব সমাজে কখনো প্রতীয়মান।

জীবনের নানাকৌণিক বিষয়াবলী

মানব জীবনের এই সব টুকরো টুকরো চিত্র-চরিত্র আর ঘটনা পরস্পরার ভাষিক বুননে নজরুল মানসের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ যুবক-যুবতীর স্বাধীন প্রেমের প্রতি রোমান্টিক আকুলতা স্বাজাত্যবোধ যেমন: মূর্ত হয়ে উঠেছে, তেমনিভাবে এসব গল্পে নারী জীবনের বিড়ম্বনা, গ্রামীণ জীবনের পরিপ্রেক্ষিত ও সংকীর্ণতা সমকালীন আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতার টুকরো টুকরো অনুষঙ্গ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য ও সূচিত হয়েছে অনায়াসে। গল্প চরিত্রের নামকরণে নজরুল বাংলা ও ভারতের সমাজ অঙ্গনে মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত নাম শব্দকে উপজীব্য করেছেন। শুধুমাত্র "রাক্ষুসী" ও "বনের পাপিয়া" গল্পের চরিত্রের নামকরণে মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিবর্তে ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম শব্দকে ব্যবহার করেছেন। অথচ তাঁর কোন গল্পের বিষয়বস্তু ও জীবন ভাষ্য সম্প্রদায় নির্ভর নয়। বরং বিস্ময়কর নৈপুণ্যে তার সব গল্পে সম্প্রদায় নিরপেক্ষ জীবন দৃষ্টি ও জীবনভাষ্য প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বে নজরুল হিন্দু-মুসলিম মিথ ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে যে উদার অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদকে বাঙালি জনমানসে সুদৃঢ় করেছিলেন তাঁর অধিকাংশ গল্পের চিত্র চরিত্র মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও গল্পকার নজরুলের মধ্যে সেই অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানবতাবাদী জীবনদৃষ্টি ও ভাষ্যকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। একই সঙ্গে তার এসব গল্পে সমকালীন ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা যেমন বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে,

তেমনিভাবে এসব গল্পে নিম্নবর্গের জীবন খণ্ড খণ্ড ঘটনা প্রবাহের ধারাক্রমে নতুন যুগের ধারাভাষ্য হয়ে উঠেছে" [২৯]। প্রকৃতপক্ষে গল্পকথকের ভঙ্গির কারণে এসব গল্প চরিত্রের আবেগ, অনুভব গতিশীল, অনেকাংশে তা মনোসমীক্ষাণধর্মী ও চেতনা প্রবাহরীতির অবভাসকে ধারণ করেছে।

উপসংহার

নজরুল গল্পে যুবক-যুবতীর স্বাধীন প্রেম আর স্বাজাত্যবোধের যে টানাপড়েন, যে রোমান্টিক অনুভাবনার জারক রসে সিক্ত সেই সব গল্পের পাত্র-পাত্রীরা অনেকাংশেই পরিবার বিচ্ছিন্ন ছন্নছাড়া ভবঘুরে প্রকৃতির। কিন্তু এই পরিবার বিভিন্ন রোমান্টিক যুবক যুবতীর জীবন চিত্র রূপায়নের পাশাপাশি তাঁর গল্পে পারিবারিক জীবন তাঁর টানাপড়েন ও চিত্র চরিত্র নিখুঁত বর্ণনায় ওঠে এসেছে। "আগ্নেয়গিরি" গল্পে নসীব আলীর পরিবারের গার্হস্থ্য জীবন, "জিনের বাদশা", গল্পের আল্লারাখ ও চানভানুর পরিবারের গার্হস্থ্য জীবন, "শিউলিমালা" গল্পে প্রফেসর চৌধুরীর যাপিত জীবন, "বনের পাপিয়া"তে গার্হস্থ্য জীবন "স্বামীহারা" গল্পে বেগমের স্বামী আজিজের পারিবারিক জীবন, খুঁনসুটিসহ বিশ্বস্ত বর্ণনায় আবহমান বাংলার সমাজ জীবনের পারিবারিক জীবনকেই প্রতিনিধিত্ব করে। এসব পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিতের গল্পগুলিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, পিতা-মাতার সন্তান বাৎসল্য নিপুণ দক্ষতায় বর্ণিত হয়েছে। এগুলোতে মাতৃস্নেহের মহিমাময় প্রকাশে চিরকালীন মাতৃমূর্তির প্রত্নপ্রতিম গল্পগুলোকে মনোমুগ্ধকর করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে এই মাতৃমূর্তি দেশমাতৃকার ধারণার সাথে অঙ্গীকৃত হয়ে উনিশ বিশ শতকের বাংলার সমাজ জীবনে অঙ্কুরিত দেশাত্ববোধের অনুপম চৈতন্যে আভাসিত হয়ে উঠেছে, যা সমকালীন ঔপনিবেশিক বাতাবরণে জাতীয় জাগরণের অনুঘটক হিসেবে স্বক্রিয় চালকে পরিণত হয়েছে" [৩০]। নজরুলের ছোটগল্পগুলোতে পাঠকের আত্মসচেতনতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। যা গঠনরীতি, বিষয়বস্তু-চয়ন, চরিত্রসৃষ্টি, কথোপকথন, পরিবেশ সৃষ্টি প্রভৃতিতে প্রতীয়মান হয়। ভাষাশৈলীর বৈচিত্রতার কারণে নজরুল নিঃসন্দেহে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় একজন গল্পকার। তিনি তাঁর গল্পে প্রতিফলিত উদার, অসাম্প্রদায়িক জীবনদৃষ্টি ও নিম্নবর্গের জীবনচিত্রণের পথিকৃৎ গল্পকার। মানুষের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণে তিনি কঠোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্মম সততার পরিচয় দিয়েছেন। যা বাংলা সাহিত্যের গল্পকারদের সামনে নতুন মাইলফলক।

তথ্যসূত্র

১. রশীদ হায়দার (সম্পাদক) (২০১০), নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২৭তম সংকলন পৃ: ১৩৫-১৩৬।
২. রশীদ হায়দার (সম্পাদক) (২০১০), নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২৭তম সংকলন পৃ: ১৩৬।
৩. রশীদ হায়দার (সম্পাদক) (২০১০), নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিক, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২৭তম সংকলন পৃ: ১৩৬।
৪. রশীদ হায়দার (সম্পাদক) (২০১০), নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২৮তম সংকলন। পৃ: ১৩০-১৩১।
৫. রশীদ হায়দার (সম্পাদক) (২০১০), নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২৭তম সংকলন পৃ: ১৩২।
৬. রশীদ হায়দার (সম্পাদনা) (২০১৩), নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃঃ ২৭।
৭. রশীদ হায়দার (সম্পাদনা) (২০১৩), নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃঃ ২৯।
৮. রশীদ হায়দার (সম্পাদনা) (২০১৩), নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃঃ ২৯।
৯. রশীদ হায়দার (সম্পাদনা) (২০১৩), নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃঃ -২৩।
১০. রশীদ হায়দার (সম্পাদনা) (২০১৩), নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃঃ ২৯।
১১. রশীদ হায়দার (সম্পাদনা) (২০১৩), নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃঃ ১৩১।
১২. শাহানাজ মুন্নী (১৯৯৭), নারী জাগরণ ও নজরুল-সাহিত্যে নারী, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃঃ ৫৭- ৫৮।
১৩. আবদুল আজীজ আল-আমান (১৯৮০), নজরুল রচনা সম্ভার-২, কলিকাতা: হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। পৃষ্ঠা ৩৩৪।
১৪. আবদুল আজীজ আল-আমান (১৯৮০), নজরুল রচনা সম্ভার-২, কলিকাতা: হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। পৃঃ ৪০৩।
১৫. আবদুল আজীজ আল-আমান (১৯৮০), নজরুল রচনা সম্ভার-২, কলিকাতা: হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। পৃঃ ৪০৬।
১৬. শাহানাজ মুন্নী (১৯৯৭), নারী জাগরণ ও নজরুল-সাহিত্যে নারী, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিউট, পৃঃ৬১।
১৭. শাহানাজ মুন্নী (১৯৯৭), নারী জাগরণ ও নজরুল-সাহিত্যে নারী, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিউট, পৃঃ ৩৫৭।
১৮. শাহানাজ মুন্নী (১৯৯৭), নারী জাগরণ ও নজরুল-সাহিত্যে নারী, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিউট, পৃষ্ঠা ১৩২।
১৯. শাহানাজ মুন্নী (১৯৯৭), নারী জাগরণ ও নজরুল-সাহিত্যে নারী, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিউট, পৃঃ ১৩৪।
২০. শাহানাজ মুন্নী (১৯৯৭), নারী জাগরণ ও নজরুল-সাহিত্যে নারী, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিউট, পৃঃ ৪৫০।
২১. শাহানাজ মুন্নী (১৯৯৭), নারী জাগরণ ও নজরুল-সাহিত্যে নারী, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিউট, পৃ: ১৩৬।
২২. শাহানাজ মুন্নী (১৯৯৭), নারী জাগরণ ও নজরুল-সাহিত্যে নারী, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিউট, পৃঃ ১৩৬।
২৩. আতাউর রহমান (১৯৯৭), নজরুলের জীবনে প্রেম ও বিবাহ, ঢাকা: শুভ্রা প্রকাশনী, পৃ: ২৮৭।

২৪. আতাউর রহমান (১৯৯৭), নজরুলের জীবনে প্রেম ও বিবাহ, ঢাকা: শুভ্রা প্রকাশনী, পৃঃ ৩৩৮।
২৫. শাহনাজ মুন্নী (১৯৯৭), নারী জাগরণ ও নজরুল-সাহিত্যে নারী, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৭, পৃঃ ৬২।
২৬. রশীদ হায়দার (সম্পাদনা) (২০১৩), নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট। পৃঃ ৬৫।
২৭. রশীদ হায়দার(সম্পাদক) (২০১০), নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২৮তম সংকলন। পৃ: ১৩৯।
২৮. রশীদ হায়দার (সম্পাদক) (২০১০), নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২৭তম সংকলন, পৃ: ১৩৮।
২৯. রশীদ হায়দার (সম্পাদক) (২০১০), নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২৭তম সংকলন, পৃঃ ১৩৮।